বসন্ত-সংলাপ

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

শৈশব থেকে বার্ধক্য—দীর্ঘ যাত্রাপথ মানুষের জীবন-সংগ্রামের এক আশ্চর্য দলিল। আমিও ব্যতিক্রম নই। এখনো পর্যন্ত যতটুকু পথ অতিক্রম করেছি—তাও বেশ ঘটনাবহুল। মাঝেমাঝেই ভাবনায় ভিড় করে আসে অজস্র মুখের মিছিল, ফেলে আসা সময়ের বর্ণময় ছবি। ভাবতে ভালো লাগে—সময়ের আবর্তে পাক খেতে খেতে আমার সুযোগ হয়েছে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম পরিবেশ থেকে শুরু করে তথাকথিত টপ-সোসাইটির রঙিন বৃত্তে ঘোরাঘুরির। শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছতে বহুবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি বিচিত্র পথের বাঁকে। বিভিন্ন ধারার মানুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি। আর এই সবকিছুই আমার গল্পলেখায় রসদ এবং প্রেরণা দিয়েছে। এই গল্প-সংকলনের প্রায় প্রত্যেকটি গল্প বিভিন্ন সময়ে নামী-অনামী দৈনিক-পাক্ষিক-মাসিক—নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনও ঘরকন্নার বাইরে অন্যকোনো কাজ করতে গেলে মহিলাদের লড়াই করতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। আমার সৌভাগ্য আমার লেখালেখির ব্যাপারে আমার পরিবারের সকলেই সবসময় আমার পাশে থেকে প্রেরণা দিয়েছে। পারিবারিক সহযোগিতা শুধু মহিলা নয়, প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আমার পরিবারের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আর যাঁদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং সহযোগিতা আমার চলার পথের পাথেয়, তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার বসু, অশোককুমার মিত্র রাণা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়—সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এই গল্প-সংকলনের প্রকাশক পুনশ্চ তথা, সন্দীপ নায়ককে।

কলকাতা ২০১২

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বসন্ত-সংলাপ	১১
নাম-বৃত্তান্ত	১৫
কবি-সংবাদ	২৯
সমব্যথী	৩৩
আমার বন্ধু মণিদীপা	৪৫
অপরাজিতা	৫৬
অতসী	৬০
কৃতজ্ঞতা	৭১
তাৎপর্য	৭৪
বাদশা	৭৭
সতু	৯১
বন্ধু	৯৭
উপলব্ধি	১০৩
তমসা	১০৬
আশীর্বাদ	১১৪
কেউ দায়ী নয়	১১৮
ক্রাশ	১২২
বিবাহবার্ষিকী	১৩০
চেনা-অচেনা	১৩৪
রিলেটিভ	১৩৯
বিপদ সংকেত	১৪৩
দত্তক	১৪৮
অমরাবতী	১৫২
প্রেম-পরম্পরা	১৫৭

বসন্ত-সংলাপ

দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত জীবনের পঞ্চাশটি বসন্ত। বসন্ত চিরদিনই চঞ্চল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত যেন ক্ষণস্থায়ী অধরা হয়ে যাচ্ছে। দখিন হাওয়া অনুভবে প্রায় ধরা পড়ে না, যদিও গাছে গাছে আগুন ঝরাচ্ছে শিমুল-পলাশ। তবু বসন্ত বসন্তই। আর বসন্তর সঙ্গে আমার একটু অন্যরকম সম্পর্ক। প্রথমত শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয়ত বসন্ত উৎসব এবং তৃতীয়ত হিন্দোল সেন! তিনটি তারই একসূত্রে বাঁধা।

আমি তখন শান্তিনিকেতনে বি এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। হোস্টেলে থাকি। এম এ পড়া হবে কিনা ঠিক নেই, সুতরাং হিসেবমতো সেবছর শান্তিনিকেতনে আমার শেষ বসন্ত উৎসব। মনে মনে ছকে রেখেছি অনেক পরিকল্পনা—শেষবার চুটিয়ে মজা করে নিতে হবে। আর আসা হবে কিনা কে জানে! ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ এরকমই।

দোলের আগের দিন। মানুষের ভিড় ঠাসাঠাসি সব জায়গায়। কিচেনে ভিড়, ক্যান্টিনে ভিড় সর্বত্র মানুষ। তখন এত হোটেল বা লজও ছিল না, অনেকে বেশ কষ্ট করেই থাকত। সংগীত ভবনে প্রোসেশন ডান্সের অর্থাৎ 'ও রে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল'-এর রিহার্সাল করে আসার পর আমরা হোস্টেলে বসে হাত-গলা-খোঁপার জন্য পলাশের মালা গাঁথছিলাম আর জোর আড্ডা দিচ্ছিলাম। মধুমিতা জিজ্ঞেস করল, প্রিয়া, তোর বাড়ি থেকে কেউ এল না তো! এবার তো শেষ! আমি বললাম, মা আর বোনের তো আসার কথা ছিল। হঠাৎ দিদার শরীরটা খারাপ হয়েছে, সেইজন্য আসতে পারল না। খুব খারাপ লাগছে।

মধুমিতা মজা করে বলল, হুঁ, অত খারাপ লাগত না, যদি একটা বয়ফ্রেন্ড থাকত!

দেব একটা—বলে আমি যেই হাত তুলেছি, অমনি সামনে আবির্ভূতা হলেন স্বয়ং সুপার। ছদ্ম গাম্ভীর্য এনে বললেন, শোন মেয়েরা, আজ কিচেনে খুব ভিড়। আমি চাই তোমরা তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে সাড়ে নটার মধ্যে হোস্টেলে ফিরে এসো।

কম্যান্ড দিয়ে অ্যাবাউট টার্ন করে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন সুপার। সমবেত হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েরা। জমাটি আড্ডা ভেঙে পোশাক বদলে হেলতে দুলতে অবশেষে আমরা যখন কিচেনে পৌঁছোলাম, তখন ঘড়িতে নটা দশ। কিচেনে তখনও বেশ ভিড়। প্রচুর অচেনা মুখ। ঠেলাঠেলির মধ্যেই থালায় খাবার নিয়ে বসার জায়গা খুঁজছি, পিছনের টেবিল থেকে মধুমিতা হাত তুলে ডাকল। আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা! কে কার সঙ্গে ধাক্কা বোঝার আগেই ভদ্রলোক আমাকে ধরে ফেলল, নাহলে হয়তো টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যেতাম।

খাবারের প্লেট-উলটে খাবার তো ছত্রাকার হয়ে গেছে। আমার খারাপ লাগছিল ভদ্রলোকের শার্টটা খারাপ হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার! কিচেনের কেয়ারটেকার মোহনদা ছুটে এল, কি হল, লাগেনি তো! মধুমিতারাও একে একে অকুস্থলে হাজির হল। আমি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছি, বললাম, না না, আমার কিছু হয়নি, ওরই শার্টটা নষ্ট হয়ে গেল, খুব খারাপ লাগছে। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, কী আর করা যাবে, নষ্ট হয়েছে এটা তো ঠিক। আমার মনে হয় এখন ওসব ভাবনা না ভেবে আর একটা প্লেট নিয়ে খাওয়া শুরু করা দরকার। ওকথা শুনে সবাই আবার বাস্তবে ফিরে এলাম, মনে পড়ল সুপারের অমোঘ বাণী। মধুমিতা আমার জন্য তড়িঘড়ি খাবার আনতে গেল। ভদ্রলোক, আসি দেখা হবে—বলে বিদায় নিল। উৎসবের মেজাজে সবাই। হই হট্টগোল তুমুল আড্ডা চলল প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত। তার মধ্যে সদ্য সদ্য একটা মজার ইস্যু পাওয়া গেছে—আমার ধাক্কা। সেই চিত্রনাট্য এখন শাখা-প্রশাখা ছাড়িয়ে পুষ্প-পল্লবিত হয়ে কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জানিনা।

শুরু করেছিল বিপাশা, তা প্রিয়া, ধাক্কাটা জেনেশুনে, না আচম্‌কা! আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, সে আবার কী কথা! জেনেশুনে কেউ ধাক্কা খায়, তাও খাবারের থালা হাতে! দমবার পাত্রী নয় বিপাশা, আরে চটছিস কেন, তুই না জানতে পারিস, আমি জানি, উদ্দেশ্য থাকলে মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নেই। আমি বললাম, সেটা অন্য কথা। অমর এক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্য থাকবে।

কেন, মধুমিতা বলল, ভদ্রলোক নাকি দারুণ হ্যান্ডসাম, ভীষণ স্মার্ট!

সে তো ধাক্কা খাওয়ার পরে দেখেছি। বাজে না বকে কাজে মন দে—যেই বলেছি, অমনি সবাই সমবেতভাবে গাইতে শুরু করল, আজি দখিন দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো...

কেন জানিনা মনটা উদাস হয়ে গেল।

পরদিন যথাসময়ে শুরু হল বসন্ত উৎসব। প্রোসেশন ডান্সের পরে আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠান। শেষ গান 'যাও গো এবার যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে' শেষ হতেই আমি ছুট লাগালাম হোস্টেলের দিকে। যেহেতু নাচে অংশগ্রহণ করেছিলাম তাই

আবিরের প্যাকেট সঙ্গে আনা হয়নি। সেই ভোর থেকে সাজগোজ পর্ব চলছে, খিদেও পেয়েছিল খুব। টুকটাক কিছু খাবার আর আবিরের প্যাকেট আনার জন্যই হোস্টেল ছোটা। চৈতী পেরিয়েই মুখোমুখি ধাক্কা! বিস্ময়ের ব্যাপার আবার সেই ভদ্রলোক! তখনও ধরে আছে আমাকে। লজ্জায় চোখে জল এসে গেল। ছি ছি কী বাজে ব্যাপার! অন্ধের মতো ছুটছি! সরে এলাম। ভদ্রলোক বলল, প্রিয়া, চমকাবেন না, কাল রাতে আপনাদের বন্ধুদের কাছে নামটা শুনেছি, ম্যাজিক জানিনা। আপনার এত তাড়া কিসের! এই তো সবে পথ চলা শুরু, সামনে কত চড়াই-উতরাই তার ঠিক আছে! সামলে চলুন। বললাম, আমি আবির আনতে হোস্টেলে যাচ্ছি।

ঠিক আছে চলুন—বলে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। আমার একটু অস্বস্তিই হচ্ছিল, কিন্তু কী আর করা যাবে। হোস্টেলের গেটে পৌঁছে সে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ঘর থেকে দু-তিন প্যাকেট বিস্কুট চানাচুর আর আবির নিয়ে বেরিয়ে এলাম এবং শুরু করলাম উলটোপথে হাঁটা। চুপচাপ হাঁটছি। নীরবতা ভেঙে সে বলল, আপনি বেশ ভালো শ্রোতা আমি বুঝতে পারছি। তাই বলে আমার নামটাও জানতে চাইবেন না এটা আশা করিনি। আমার বিব্রত মুখ দেখে আবার শুরু করল, তবুও আমি উপাযাচক হয়ে জানাচ্ছি—আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমার জেঠু ফাল্গুন মাসে জন্ম বলে আমার নাম রেখেছে হিন্দোল—হিন্দোল সেন, পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বয়স সাতাশ...

এবার আর হাসি চাপা গেল না, সশব্দে হেসে উঠলাম আমি। ইতিমধ্যে চৈতীর সামনে পৌঁছে গেছি আমরা। আমি দাঁড়িয়ে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করল, কি হল যাবেন না! ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ যাব, তবে—

ও বুঝতে পেরেছি, আমি সঙ্গে গেলে চলবে না, তাই তো! ওর দুচোখে কৌতুক, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। ঠিক আছে যাব না, একটু আবির দিই! দেখি মুখটা—বাঁ-হাত দিয়ে মুখটা আলতো করে তুলে ধরল, কিছুক্ষণ দৃষ্টি সরল।

না। তারপর পরম মমতায় কপালে গালে চিবুকে আবির মাখিয়ে দিল। একজন নারী হিসেবে এই প্রথম পুরুষের স্পর্শ অনুভব করলাম। অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর শিহরণে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কিছু না বলেই দৌড় লাগালাম।

কানে ভেসে এল, আমার পাওনাটা কিন্তু ডিউ রয়ে গেল...। পালিয়ে তো এলাম, আবিরও খেললাম, আড্ডা নাচ-গান সবই হলো কিন্তু সবকিছুই করে গেলাম নেশাগ্রস্থ যন্ত্রের মত। তৃষ্ণার্ত মন আর চোখ সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। একেই কী বলে প্রেম, নাকি, মোহ! না, মন শক্ত করতে হবে, প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

সন্ধেবেলায় গৌরপ্রাঙ্গণ মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবাই খুব সাজগোজ

করছে। আমি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করি কিন্তু বিশেষ সাজগোজ করি না। আজ কিন্তু আমার খুব সুন্দর করে সাজতে ইচ্ছে করল। বন্ধুরা উৎসবের মেজাজে মশগুল ছিল, তাই লক্ষ করল না। তা নাহলে ঠিক আমার পিছনে লাগত। আমরা যখন পৌঁছোলাম, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। ভিড়ে ঠাসা বিশাল গৌরপ্রাঙ্গণ। আমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান দেখা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য আনন্দ করা। এই তো শেষ আড্ডার সুযোগ। আমরা দল বেঁধে পিছনে গিয়ে গোল হয়ে আড্ডা দিতে বসলাম।

সুন্দর আলো-আঁধারি পরিবেশ, কানে ভেসে আসছে সুরেলা গানের রেশ, বন্ধুদের উচ্ছ্বাস। তবু ভারাক্রান্ত মনটাকে কিছুতেই শাসনে আনতে পারছি না। সত্যিই কি আর দেখা হবে না। সময় এগোনোর সাথে সাথে আমাদের গোল ক্রমশ ছোট হতে থাকল, অবশেষে দেখা গেল আমরা তিনজন অবশিষ্ট। দুজন আলু-কাবলি খেতে গেল, আমি ঘন্টাতলায় গিয়ে বসলাম। মিনিট পাঁচেকের মাথায় হঠাৎ কানের কাছে 'হ্যালো' শুনে চম্‌কে দাঁড়ালাম। সব ক'টা দাঁত বের করে হিরোর মতো দাঁড়িয়ে হিন্দোল সেন। আমার সবকিছু কেমন ওলোট-পালট হয়ে গেল। সত্যি কথা বলুন, আমার কথা ভাবছিলেন—হিন্দোলের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কান্না পেয়ে গেল, বয়ে গেছে আমার আপনার কথা...

দু-চারজন এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য হিন্দোল বলল, চলুন আমরা ওদিকটায় গিয়ে বসি, আপত্তি নেই তো! আম্রকুঞ্জে একটা বাঁধানো বেদিতে আমরা বসলাম।

এবার বলল, আমার ডিউ—ব্যাগ থেকে আবির নিয়ে ওর কপালে লাগিয়ে দিতেই ধরা পড়ে গেলাম নিবিড় আলিঙ্গনে। কিছুক্ষণ পরে বলল, শোন প্রিয়া, হাতে সময় খুব কম অথচ খুব জরুরি কয়েকটা কথা বলা দরকার। তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানো না, আমিও তোমাকে তেমন জানি না। কিন্তু আমার মন বলছে আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এরপর সময় বলে দেবে সঠিক কথা। তুমি কী বলো!

আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু তুমি কদিন থাকবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। আমাকে ফিরতে হবে।

ও বলল, চল, যেতে যেতে বলি। আমি কাল সকালেই চলে যাচ্ছি। পরশু জাহাজে জয়েন করতে হবে। আমি পৌঁছেই তোমাকে চিঠি লিখব হোস্টেলের ঠিকানায়, চিঠিতে আমার ঠিকানা জানিয়ে দেব। চিঠি লিখবে কিন্তু। হোস্টেলের গেটে গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল হিন্দোল।

সেই শেষ দেখা। চিঠি আসেনি। কেন আসেনি জানিনা বলেই হয়তো কোনোদিন আমার মনে হয়নি হিন্দোল আমাকে ঠকিয়েছে, বরং মনে হয়েছে ওর কোনো বিপদ হয়নি তো!...

নাম-বৃত্তান্ত

সর্বশেষ প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা হতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গোবিন্দগোপাল গোস্বামী।.প্রায় টানা দুঘণ্টা মঞ্চের চড়া আলোয় ওঠ-বোস করে অতগুলি শিশুর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া কী চাট্টিখানি ব্যাপার! তবে ইদানিং নানা জায়গায় গিয়ে তার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে—এখনকার মা-বাবারা আর যাই হোক, বাচ্চাদের নাম রাখার ব্যাপারে খুব সচেতন। নাম যে মানুষের জীবনে কতবড়ো ফ্যাক্টর হতে পারে তার মতো আর কে জানে! রবীন্দ্রনাথ যতই লিখুন 'নামে কি করে'! নমস্যরা যতই বলুন, মানুষই আসল, নামের তেমন কোনো মাহাত্ম্য নেই জীবনে—গোবিন্দগোপাল কখনও একমত হবে না। প্রথম ঝামেলাটা হয়েছিল জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মে। ঠিক আছে, নিদেনপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ রাখতে পারত! যুক্তি হল, দাদুর নাম মদনগোপাল, সুতরাং তারটা গোবিন্দগোপাল আটকায় কে! ফলশ্রুতি—ডাকনাম অবধারিতভাবে গোবিন্দ এবং তা থেকে গবা, গোবিন, গোবু। হয়তো আই কিউ লেভেল ছোটো থেকেই বেশি কিংবা সৌন্দর্যবোধ কিছু একটা হবে—কারণ সেই অবোধ ছোটোবেলা থেকেই নিজের নামটা তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। স্কুলে ভরতি হওয়ার পরে পরেই মাকে বলেছিল, আমার নামটা খুব বিচ্ছিরি, পালটে দাও না মা। যেন বিরাট অপরাধ হয়ে গেছে এমন ভাব করে জিভ কেটে মা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, ছিঃ বাবা, ও কথা বলে না। তোমার দাদু কত আদর করে তোমার নাম রেখেছেন। উনি শুনলে দুঃখ পাবেন। ক্লাস সিক্সে অ্যালজেব্রা শুরু হবার পরে বন্ধুরা নতুন করে ডাকতে শুরু করল জি-কিউব।

এরমধ্যে গ্রীষ্মের ছুটিতে গেল মামার বাড়ি। ছোটো শহরতলি। স্টেশন থেকে বড়োজোর এক কিলোমিটার পথ। রিক্সায় মার সঙ্গে গোবিন্দ, পাশে পাশে সাইকেল চালিয়ে ছোটোমামা। এবার মনে মনে একটা প্ল্যান করে এসেছে